শিশু সাহিত্য ও সুকুমার রায়

হেড আফিসের বড় বাবু লোকটি বড়ই শান্ত,

তার যে এমন মাথার ব্যামো কেউ কখনও জান্‌ত ?

দিব্যি ছিলেন খোস্‌মেজাজে চেয়ারখানি চেপে,

একলা ব'সে ঝিমঝিমিয়ে হঠাৎ গেলেন ক্ষেপে !

আঁৎকে উঠে হাত পা ছুঁড়ে চোখটি ক'রে গোল ....

শিশুদের জন্য এমনি অনেক মজার ছড়া লিখে গেছেন সুকুমার রায়। ‘গোঁফের আমি গোঁফের তুমি, তাই দিয়ে যায় চেনা।’ এমন আজগুবি অথচ সার্থক রচনা ছিলো সুকুমার রায়ের।

‘আবোলতাবোল’ গ্রন্থের ভূমিকায় নিজেই লিখেছিলেন, ‘যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব, তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়াল রসের বই, সুতরাং সে রস যাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন না, এ পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে।’

মানুষের বয়সের ভিন্নতায় চিন্তার ধরণও ভিন্ন। বড় এবং ছোটদের চিন্তা এক হওয়া কখনও সম্ভব নয়। বড়রা মন-মানষিকতায় জটিল হলেও ছোটদের ভাবনা সহজ-সরল। ছোটদের জগত ভিন্ন, আলাদা। শিশু ও কিশোর মনের উপযোগি যে সাহিত্য রচিত হয় মূলত তা-ই শিশু সাহিত্য। তাদের উপযোগী করে সাহিত্য রচনা করে সহজেই ছোটদের মন আকর্ষণ করানোর মধ্যদিয়ে তাদের ভাবনার রাজ্যের প্রসারতা বৃদ্ধি ও উন্নত চরিত্র গঠন সম্ভব ।

সপ্তম শতকে ল্যাটিন ভাষায় আদি শিশু সাহিত্য রচিত হয়। ঊনবিংশ শতকে জার্মান রূপকথা, এডওয়ার্ড লিয়ারের ‘বুক অব ননসেন্স’, ‘লুইস ক্যারলের’ ‘আজব দেশে এলিস’ প্রভৃতি শিশু সাহিত্যে এক অনন্য সংযোজন। প্রায় দু’শ বছর আগে অথ্যাৎ ১৮১৬ সালে বাংলা ভাষায় ছোটদের জন্যে সাহিত্য রচনা শুরু হয়। অবশ্য শিশু-সাহিত্যকে সাহিত্যের ভিন্ন বিষয় হিসাবে ভাবা হয়েছে আরো অনেক পরে। ১৮৯৯ সালে যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬-১৯৩৭) সংকলিত বাংলা ভাষার প্রথম উদ্ভট ছড়াগ্রন্থের ভূমিকাতে ‘শিশু-সাহিত্য’র প্রথম সন্ধান মেলে। ভূমিকাতে রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী (১৮৬৪-১৯১৯) শিশু-সাহিত্য শব্দটি ব্যবহার করেন।

১৮৯১ সালে প্রকাশিত ‘হাসি ও খেলা’ নামে যোগীন্দ্রনাথ সরকার রচিত গ্রন্থটি আদর্শ শিশুতোষ গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বোদ্ধা মহলের অনেকেই গ্রন্থটিকে বাংলায় লেখা প্রথম শিশুতোষ গ্রন্থ বলে মনে করেন। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের অন্যান্য শিশুতোষ গ্রন্থের মধ্যে ছিল ‘রাঙাছবি’ (১৮৯৬), ‘হাসিখুশি’ (১ম ভাগ ১৮৯৭) প্রভৃতি।

১৮১৮ সালে ‘নীতিকথা’ নামে ১৮টি উপদেশমূলক গল্প নিয়ে প্রকাশিত পাঠ্যবইটিকে অনেকেই বাংলা শিশু সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ হিসেবে বিবেচনা করেন। ‘স্কুল বুক সোসাইটি’র সহোযোগীতায় বইটির রচনায় রাধাকান্ত দেব বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন। ‘নীতিকথা’ প্রকাশের ক্ষেত্রে সে সময়ের অন্যতম সমাজসেবক পণ্ডিত রামকমল সেন এবং তরুণীচরণ মিত্রের সঙ্গে ‘স্কুল বুক সোসাইটি’র সম্পর্ক এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়।

১৮৩৯ সালের ১৪ জুন প্রতিষ্ঠিত ‘বাংলা পাঠশালা’, ১৮৪৬ সালের ১ মার্চ তারিখে প্রতিষ্ঠিত ‘হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়’, ১৮৪৫ সালে প্রতিষ্ঠিত ‘ব্রিটিশ-ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন’ এবং ১৮৪৩ সালের ২ মে প্রতিষ্ঠিত

‘হিন্দু মেট্রোপলিটন কলেজ’ প্রতিষ্ঠায় রাধাকান্ত দেবের অসামান্য অবদান ছিল, ‘বাংলা পাঠশালা’ এবং ‘তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা’ থেকেও পাঠ্যপুস্তক প্রকাশিত হয়েছিল। ১৮২১ সালে রাধাকান্ত দেব ‘বাঙ্গলা শিক্ষা গ্রন্থ’ রচনা করেন। তবে বাংলা শিশুসাহিত্যের প্রকৃত বিস্তার লাভ করে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), মদন মোহন দত্ত (১৮১৭-১৫৫৮), এবং অয় কুমার দত্তের ‘চারুপাঠ’-এর তিনটি খণ্ড প্রকাশের মাধ্যমে।

শিশুগ্রন্থ হিসেবে খণ্ড তিনটি ভীষণ জনপ্রিয় হয়। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ‘বোধোদয়’ শীর্ষক অনুবাদগ্রন্থ (১৮৫১), ‘বর্ণ পরিচয়’ (১ম ও ২য় ভাগ ১৮৫৫), ‘ঈশপের নির্বাচিত গল্পের অনুবাদ’, ‘কথামালা’ (১৮৫৬), অনুবাদ গ্রন্থ ‘আখ্যাণমঞ্জুরী’ (১৮৬৩) এবং মদন মোহন তর্কালঙ্কারের তিনভাগে ‘শিশুশি’ মোদ্দাপাঠ হিসেবে বিবেচিত হয়।

উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর (১৮৬৩-১৯১৫) ‘ছোটদের রামায়ন’ (১৮৯৪-১৮৯৫), ‘সে কালের কথা’ (১৯০৩), ‘ছোটদের মহাভারত’ (১৯০৯), ‘মহাভারতের গল্প’ (১৯০৯) ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ বাংলা শিশু সাহিত্যের চিরকালীন সম্পদ।

শিশুসাহিত্যের সমৃদ্ধ ধারায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। (১৮৬১-১৯৪১)। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৭১-১৯৫১), কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬), যোগীন্দ্রনাথ সরকার (১৮৬৬-১৯৩৭), নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৮৫৯-১৯৩৯), দণিারঞ্জন মিত্র মজুমদার (১৮৭৭-১৯৫৭), যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৫), সুকুমার রায়, (১৮৮৭-১৯২৩), দীনেন্দ্র কুমার রায় (১৮৬৯-১৯৪৩), খগেন্দ্রনাথ মিত্র (১৮৮৪-১৯৭৮), সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপধ্যায় (১৮৮৪-১৯৬৬) শরবিন্দু বন্দোপাধ্যায় (১৮৯৯-১৯৭০), হেমেন্দ্র কুমার রায় (১৮৮৮-১৯৬৪), সুনির্মল বসু (১৯০২-১৯৫৭), বিভুতিভুষণ মুখোপধ্যায় (১৮৯৪-১৯৮৭), শিবরাম চক্রবর্তী (১৯০৩-১৯৮০), রবীন্দ্রলাল রায় (১৯০৫-১৯৭৮), বিমল ঘোষ (১৯১০-১৯৮২), নীহার রঞ্জণ গুপ্ত (১৯১১-১৯৮৬), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপধ্যায় (১৮৯৮-১৯৭১), এয়াকুব আলী চৌধুরী (১৮৮৮-১৯৪০), প্রেমেন্দ্র মিত্র (১৯০৫-১৯৮৮), বন্দে আলী মিয়া, (১৯০৬-১৯৭৯), মোহাম্মদ মোদাব্বের (১৯০৮-১৯৮৪), খান মুহাম্মদ মইনুদ্দীন (১৯০১-১৯৮১), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৮), নারায়ণ গঙ্গোপধ্যায়, অখিল নিয়োগী, লীলা মজুমদার, হরিসাধণ মুখোপাধ্যায়, কুদুমরঞ্জন মল্লিক, কাজী কাদের নেওয়াজ, মোহাম্মদ নাসির উদ্দীন, হোসনে আরা, আবদুর রহমান, সাজেদুল করিম, রোকনুজ্জামান খান (দাদা ভাই), আতোয়ার রহামান, আলমগীর জলিল, গোলাম রহমান, আবদুল্লাহ আল মূতী শরীফুদ্দিন, কাজী আবুল হোসেন, সুকুমার বড়ুয়াসহ অনেকেই বাংলা শিশু সাহিত্যকে সমৃদ্ধি দান করেছেন।

সুকুমার রায়

১৮৮৭ সালের ৩০ অক্টোবর ময়মনসিংহ জেলার মসূয়া গ্রামে সুকুমার রায়ের জন্ম। তার পিতা ছিলেন প্রখ্যাত শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়। সুকুমার রায়ের পুত্র সত্যজিৎ রায়ও স্বমহিমায় বাংলা সাহিত্য ও বাংলা চলচ্চিত্রকে সারাবিশ্বে পরিচিত করেছেন।

পড়াশোনার শুরুতে শিশু সুকুমার রায় ভর্তি হন কলকাতা সিটি স্কুলে। কলকাতা সিটি স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে সুকুমার রায় ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র অবস্থাতেই সুকুমার রায়ের শিশুসাহিত্যের প্রতিভার বিকাশ ঘটে। এ সময় তিনি ‘ননসেন্স কাব’ প্রতিষ্ঠা করেন। যার মুখপাত্র ছিল ‘সাড়ে-বত্রিশ বাজা’। এই কলেজ থেকেই তিনি রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে বি.এস.সি ডিগ্রী অর্জন করেন। ১৯১১ সালের গুরুপ্রসন্ন বৃত্তি লাভের মাধ্যমে ফটোগ্রাফি ও প্রিন্টিং টেকনোলজিতে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য ইংল্যান্ড গমন করেন।

ইংল্যান্ড থেকে উচ্চ শিক্ষা শেষে দেশে ফিরে পিতার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ইউ.রায় এন্ড সন্স কোম্পানিতে কাজ শুরু করেন। ১৯১৫ সালে বাবা উপেন্দকিশোর রায়ের মৃত্যুর পর প্রতিষ্ঠানটির পরিচালক নিযুক্ত হন। এ সময়ই তিনি ‘মানডে’ ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৫-১৯২৩ সাল পর্যন্ত তিনি সন্দেশ পত্রিকা

সম্পাদনা করেন।

সুকুমার রায় একাধারে শিশুসাহিত্যিক, রম্যরচনাকার, লেখক, ছড়াকার, নাট্যকার এবং কার্টুনিস্ট। নিজের লেখায় কালি-কলমের আঁচড়ে চমৎকার সব কার্টুন ও ড্রয়িং এই প্রতীভার উজ্জ্বলতাকে ভাবায়। তিনি ছিলেন জনপ্রিয় শিশুসাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর সন্তান এবং তাঁর পুত্র খ্যাতিমান চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায়। সত্যজিৎ রায়ের লেখালেখিতেও পিতার অলংকরণের প্রভাব লক্ষ্যনীয়। সত্যজিৎ-ও তার মতো শিশু-কিশোরদের জন্য লেখা ফেলুদা ও প্রফেসর শঙ্কু সিরিজের প্রায় সবকটি বইয়ের প্রচ্ছদ ও অলংকরণ নিজেই করেছিলেন। তারও লেখার সঙ্গে আঁকার মাধ্যম ছিল পিতার মতো --কালি-কলম।

তাঁর গ্রন্থগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো-

আবোল তাবোল

পাগলা দাশু

হেশোরাম হুশিয়ারের ডায়েরি

খাই-খাই

অবাক জলপান

লক্ষণের শক্তিশেল

ঝালাপালা ও অনান্য নাটক

হ য ব র ল

শব্দ কল্প দ্রুম

চলচ্চিত্তচঞ্চরী

বহুরুপী

ভাষার অত্যাচার

ছড়াকার হিসেবে বাংলা সাহিত্য তাঁর স্থানটি আজো শীর্ষে। শুধু জনপ্রিয় শিশুসাহিত্যিকই নন, বাংলা ভাষায় ননসেন্স্-এরও প্রবর্তক তিনি । মৃত্যুর পর একে একে প্রকাশিত ‘আবোলতাবোল’ (১৯২৩), ‘হ-য-ব-র-ল’ (১৯২৪), ‘পাগলা দাশু’ (১৯৪০), ‘বহুরূপী (১৯৪৪), ‘খাই খাই’ (১৯৫০) বাংলা শিশু সাহিত্যের অমর সৃষ্টি হিসেবে বাঙালির হৃদয়ে বেঁচে থাকবে।

১৯২৩ খ্রিস্টাব্দের ১০ সেপ্টেম্বর কালাজ্বরে (লেইশ্মানিয়াসিস) আক্রান্ত হয়ে মাত্র ৩৭ বছর বয়সে সুকুমার রায় মৃত্যুবরণ করেন। সেই সময় এই রোগের কোনো চিকিৎসা ছিল না। তাঁর মৃত্যু হয় একমাত্র পুত্র সত্যজিত রায় এবং স্ত্রীকে রেখে। সত্যজিত রায় পরবর্তীতে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্রকার হিসেবে স্বীকৃতি পান। নিজের মৃত্যুর ৫ বছর আগে ১৯৮৭ সালে তিনি বাবা সুকুমার রায়কে নিয়ে একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণ করেন।

তথ্যসূত্র : ইন্টারনেট